مُخْتَصَرُ لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ গ্রন্থের অনুবাদ

সময়কে কাজে লাগান

ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি رحمه الله

সংক্ষেপণ :

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান মুহান্না

অনুবাদ :

মাওলানা আসাদ আফরোজ

মামুন বিন ইসমাঈল

মাকতাবাতুল বায়ান

সময়কে কাজে লাগান

গ্রন্থস্বত্ব © ২০২২

প্রথম সংস্করণ:
জুলাই ২০২২ খ্রিস্টাব্দ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

প্রকাশক: ইসমাইল হোসাইন

অনলাইন পরিবেশক:
ওয়াফি লাইফ, রকমারি.কম, আলাদাবই.কম

সর্বোচ্চ খুচরা মূল্য: ৫৬০ টাকা

মাকতাবাতুল বায়ান

ইসলামি টাওয়ার (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা
+৮৮ ০১৭০০ ৭৪ ৩৪ ৬৪
+৮৮ ০১৪০৫ ৩০০ ৫০০

maktabatulbayan
www.maktabatulbayan.com

সূচিপাতা

অনুবাদকের কথা ৮

সংক্ষিপ্তকারীর ভূমিকা ১০

শাইখ আবদুল আযীয তারীফি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ভূমিকা ১৫

ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী ১৭

লেখকের ভূমিকা ২০

মাজলিস : আল্লাহর স্মরণ এবং উপদেশ-নসীহতের ফযীলত ২৭

পরিচ্ছেদ : জান্নাতের বর্ণনা সম্পর্কে নবি ﷺ-এর হাদীসের ব্যাখ্যা ৩৫

মুহাররম মাসের আমল **৪২**

প্রথম মাজলিস : শাহরুল্লাহ অর্থাৎ মুহাররম মাস ও এর প্রথম দশ রাত্রির ফযীলত ৪২

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালনের মাধ্যমে নফল আমল করার ফযীলত ৪২

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের ফযীলত ৪৭

দ্বিতীয় মাজলিস : আশুরার দিনের বর্ণনা ৫৭

তৃতীয় মাজলিস : হাজিদের আগমন প্রসঙ্গে ৬৮

সফর মাসের আমল **৭৩**

রবিউল আউয়াল মাসের আমল **৮৩**

প্রথম মাজলিস : নবি ﷺ-এর জন্মসংক্রান্ত আলোচনা ৮৩

দ্বিতীয় মাজলিস : নবিজির জন্মদিন, জন্মমাস, ও জন্মবছর ১০৫
তৃতীয় মাজলিস : রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর ওফাতের বিবরণ ১১৪
নবি ﷺ-এর অন্তিমরোগের সূচনা ১৩৩

রজব মাসের আমল **১৪৫**

শা'বান মাসের আমল **১৫৪**
প্রথম মাজলিস : শা'বান মাসের সিয়াম সম্পর্কে ১৫৪
পরিচ্ছেদ ১৬৬
দ্বিতীয় মাজলিস : শবে বরাতের বর্ণনা ১৬৮
পরিচ্ছেদ ১৭৫

রমাদান মাসের আমল **১৮০**
প্রথম মাজলিস : সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে ১৮৩
দ্বিতীয় মাজলিস : রমাদান মাসে দান-সদাকা ও
কুরআন তিলাওয়াতের ফযীলত ১৯৯
তৃতীয় মাজলিস : রমাদান মাসের মধ্য দশক ও
শেষার্ধের আলোচনা ২১৮
চতুর্থ মাজলিস : রমাদানের শেষ দশকের আলোচনা ২৩১
পঞ্চম মাজলিস : রমাদান মাসের বেজোড়
শেষ সাত দিনের আলোচনা ২৩৮
ষষ্ঠ মাজলিস : রমাদান মাসের বিদায় সম্পর্কে ২৪৪

শাওয়াল মাসের আমল **২৫৭**
প্রথম মাজলিস : পুরা শাওয়াল মাস রোযা রাখা এবং
রমাদানের পর ছয়টি রোযা পালন প্রসঙ্গে ২৫৭
দ্বিতীয় মাজলিস : হাজ্জ, হাজ্জের ফযীলত এবং
হাজ্জ পালনে উৎসাহ প্রদান ২৬৩
তৃতীয় মাজলিস : হাজ্জ ও উমরা পালনে অক্ষম হলে করণীয় ২৭৯

যুল-কা'দাহ মাসের আমল **২৯৬**

যুল-হিজ্জাহ মাসের আমল **৩০৪**

প্রথম মাজলিস : যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত ৩০৪

প্রথম পরিচ্ছেদ : এই দিনগুলোতে আমলের ফযীলত ৩০৫

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অন্যান্য মাসের দশকের ওপর যুল-হিজ্জাহ মাসের দশকের শ্রেষ্ঠত্ব ৩০৭

দ্বিতীয় মাজলিস : আরাফার দিন ও ঈদুল আযহার ফযীলত ৩১৩

তৃতীয় মাজলিস : আইয়্যামুত-তাশরীকের আলোচনা ৩২৮

চতুর্থ মাজলিস : বছরের সমাপ্তির আলোচনা ৩৪০

সৌরবৎসরের বিভিন্ন ঋতুর আমল **৩৪৭**

প্রথম মাজলিস : বসন্ত ঋতুর আলোচনা ৩৪৭

দ্বিতীয় মাজলিস : গ্রীষ্ম ঋতুর আলোচনা ৩৬০

তৃতীয় মাজলিস : শীত ঋতুর আলোচনা ৩৬৩

উপসংহার : তাওবার আলোচনা **৩৭০**

অনুবাদকের কথা

اَللّٰهُمَّ مَا أَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ أَوْ بِأَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَلَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ

আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ তাআলার শুকরিয়া আদায় করছি। প্রতিটি নেককাজ কেবল তাঁর দয়া ও অনুগ্রহেই সম্পন্ন হয়। আর সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের প্রিয় নবি মুহাম্মাদ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সকল সাথিসঙ্গীদের ওপর।

প্রিয় পাঠক, আপনি এখন যে বইটি অধ্যয়ন করছেন তা হলো : مُخْتَصَرُ لَطَائِفِ الْمَعَارِفِ فِيْمَا لِمَوَاسِمِ الْعَامِ مِنَ الْوَظَائِفِ গ্রন্থের অনুবাদ। মূলগ্রন্থ *'লাতায়িফুল মাআরিফ'*-এর রচয়িতা অষ্টম শতাব্দির বিখ্যাত আলিম ও হাদীস বিশারদ ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ)। মহান এই ইমামের নাম শোনেননি এমন মানুষের সংখ্যা হাতেগোনা। তিনি জন্মগ্রহণ করেছেন ৭৩৬ হিজরিতে বাগদাদে।

'লাতায়িফুল মাআরিফ' গ্রন্থটিকে সংক্ষেপ ও পরিমার্জিত করেছেন আরবের বিখ্যাত আলিম ও লেখক শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান আল-মুহান্না। হাফিজাহুল্লাহ।

বহুদিনের প্রচেষ্টায় আমরা মহামূল্যবান এই বিখ্যাত গ্রন্থটির অনুবাদ নিয়ে এসেছি আলহামদুলিল্লাহ। কাজটি নির্ভুল করতে আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছি। সহজ ও সাবলীল করার জন্য বেশ পরিশ্রম করেছি। শেষের দিকে কিছু কবিতা বাদ দিয়েছি, যা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিতাবটির শুরু থেকে শাওয়াল মাসের আমলের প্রথম

মাজলিস পর্যন্ত আমি অনুবাদ করেছি, আলহামদুলিল্লাহ। আর তারপর থেকে শেষ পর্যন্ত অনুবাদ করেছেন মুহতারাম মাওলানা মামুন বিন ইসমাঈল সাহেব। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই কাজটুকু কবুল করুন।

হে আল্লাহ, আমাদের সকলের জন্য দুনিয়া-আখিরাতে কল্যাণের ফায়সালা করুন। বইটির মূল লেখক, সংক্ষিপ্তকারীসহ এ সংশ্লিষ্ট সবাইকে এর উত্তম বিনিময় দান করুন। বইটিকে উম্মাহর জন্য উপকারী বানান, বিশেষ করে আমার আম্মাজানের মাগফিরাতের ওসীলা হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

মাওলানা আসাদ আফরোজ

শাইখ আবদুল আযীয তারীফি (হাফিজাহুল্লাহ)-এর ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তাআলার জন্য, যিনি পরিপূর্ণ প্রশংসা পাওয়ার হকদার। আর অবিরাম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক উম্মি নবির ওপর, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সমস্ত সাথিসঙ্গীদের ওপর।

পূর্ববর্তী ইমামগণ যা কিছু রচনা করেছেন, তার মধ্যে ইমাম ইবনু রজব হাম্বালি (রহিমাহুল্লাহ)-এর রচনাগুলো অত্যন্ত মহান ও মূল্যবান। কারণ তিনি মুতাকাদ্দিমীনের ধারা ও মানহাজের কাছাকাছি ছিলেন, তিনি তাঁর রচনাগুলোকে ভরপুর ইলমি, উপকারী ও তাহকীক-সংবলিত আলোচনার মাধ্যমে সমৃদ্ধ করেছেন। আর তিনি ইমামত, বিস্তৃত ইলম এবং সূক্ষ্ম উপলব্ধি ও বুঝশক্তির অধিকারী বলে পূর্ব-পশ্চিম প্রসিদ্ধ ছিলেন।

তার মহামূল্যবান গ্রন্থগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো 'লাতায়িফুল মাআরিফ'; যেখানে একজন মুসলিম দিনে, রাতে, মাসে, বছরে অর্থাৎ তার পুরা জীবনে যেসব বিধিবিধান, আদব-আখলাক ও আচার-ব্যবহারের মুখাপেক্ষী হয়, তিনি সেগুলোকে মলাটাবদ্ধ করেছেন। যা ইবাদাতকারী ব্যক্তির জন্য পাথেয় জোগাবে, তাকে পরিচয় করিয়ে দেবে আল্লাহ তাআলা তার ওপর কী কী আবশ্যক করেছেন, তার জন্য কী কী বিধান প্রণয়ন করেছেন, যার ফলে সে নিশ্চিন্তমনে দূরদর্শিতার সাথে আল্লাহর ইবাদাত করে যেতে পারবে।

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সুলাইমান মুহান্না এই কিতাবটিকে বেশ পারদর্শিতায় পরিমার্জিত

ও সংক্ষিপ্ত করেছেন। তবে তা মূল রচয়িতার উদ্দেশ্য উপলব্ধি করতে কোনো বিঘ্নতা সৃষ্টি করবে না, বরং এটি পাঠককে কোনো দীর্ঘ আলোচনা ছাড়াই খুব সহজে মূল বিষয়বস্তু আত্মস্থ করতে সহযোগিতা করবে। এই কাজটি বেশ প্রশংসার দাবি রাখে, বিশেষ করে এই সময়ে যখন কিতাবাদির প্রতি মানুষের আগ্রহ কমে গিয়েছে, মানুষ অধ্যয়ন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তাদের মাঝে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদির প্রতি অন্যমনস্কতা ও উদাসীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে, বড়ো কলেবরের বিশাল বিশাল গ্রন্থসমূহ পাঠ করা তো অনেক দূরের কথা।

শাইখ মুহাম্মাদ মুহান্নার অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটি কাজ এটি। আশা করছি আল্লাহ তাআলার নিকট যেন এটি গ্রহণীয় হয় এবং এর কারণে তিনি বিনিময়প্রাপ্ত হন।

আল্লাহ তাআলা এই সংক্ষিপ্ত নুসখাটিকেও মূল গ্রন্থের ন্যায় উপকারী বানান, মূল লেখক, সংক্ষিপ্তকারী এবং এর প্রতিটি পাঠকের জন্য একে আখিরাতের মূল্যবান পাথেয় ও সম্বল হিসেবে কবুল করুন, আমীন।

অবিরাম সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবি মুহাম্মাদের ওপর এবং তাঁর পরিবার-পরিজনের ওপর।

আবদুল আযীয তারীফি
১২/৩/১৪৩৭ হিজরি

মুহাররম মাসের আমল

মুহাররম মাসের আমলের আলোচনা কয়েকটি মাজলিসে বিভক্ত—

প্রথম মাজলিস : শাহরুল্লাহ অর্থাৎ মুহাররম মাস ও এর প্রথম দশ রাত্রির ফযীলত

সহীহ মুসলিম-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ

> "রমাদানের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররমের সিয়াম আর ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হচ্ছে রাতের সালাত (তাহাজ্জুদ)।"[৩০]

এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা দুইটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করা হয়েছে—

এক : সিয়ামের মাধ্যমে নফল আমল এবং

দুই : কিয়াম (তাহাজ্জুদ)-এর মাধ্যমে নফল আমল।

প্রথম পরিচ্ছেদ : সিয়াম পালনের মাধ্যমে নফল আমল করার ফযীলত

উপরিউক্ত হাদীসটি এই ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলীল যে, রমাদানের পরে যে সমস্ত সিয়াম

[৩০] মুসলিম, ১১৬৩।

দ্বারা নফল ইবাদাত করা হয়, তার মধ্যে সর্বোত্তম নফল সিয়াম হলো মুহাররম মাসের সিয়াম।

এর এই ব্যাখ্যাও করা হয় যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো : রমদানের পর এটি সর্বোত্তম মাস, যার পুরোটা জুড়ে সাওম পালন করা হয়। তবে কিছু মাসের কিছু সাওম এর ব্যতিক্রম, সেগুলো এর চেয়েও শ্রেষ্ঠত্বের দাবি রাখে। যেমন : আরাফার দিনের সাওম, যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের সাওম, শাওয়াল মাসের ছয়টি সাওম ইত্যাদি।

আবার ব্যাপকভাবে নফল সাওমের ক্ষেত্রে সর্বোত্তম হলো হারাম মাসসমূহের সাওম। নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি এক ব্যক্তিকে হারাম চারটি মাসে সাওম পালনের আদেশ দিয়েছিলেন। আমরা উপযুক্ত স্থানে এর আলোচনা করব, ইন শা আল্লাহ।

হারাম মাসসমূহের মধ্যে উত্তম মাস কোনটি?

এই মাসআলা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ)-সহ আরও অনেকেই বলেছেন, 'সর্বোত্তম মাস হলো আল্লাহর মাস অর্থাৎ মুহাররম মাস। পরবর্তীদের মধ্য থেকে একটি দল এই অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন।

ওয়াহ্‌ব ইবনু জারীর (রহিমাহুল্লাহ) বর্ণনা করেছেন কুররাহ ইবনু খালিদ (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, আর তিনি বর্ণনা করেছেন হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) থেকে, তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা বছরের সূচনা করেছেন সম্মানিত (হারাম) মাস দ্বারা, আবার শেষও করেছেন সম্মানিত মাস দ্বারা। সুতরাং আল্লাহ তাআলার নিকট বছরের মধ্যে রমাদানের পরে মুহাররম মাসের চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কোনো মাস নেই। এই মাসটি অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে এর নামকরণ করা হয়েছে شَهْرُ اللهِ (আল্লাহর মাস) বলে।'

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-ও মুহাররম মাসকে 'আল্লাহর মাস' বলে অভিহিত করেছেন। আল্লাহর দিকে সম্পৃক্ত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে এর সমূহ মর্যাদা ও ফযীলত। কারণ সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে যা বিশেষ ও অতি গুরুত্বপূর্ণ আল্লাহ তাআলা কেবল সেগুলোকেই নিজের দিকে সম্পৃক্ত করেন। যেমন তিনি মুহাম্মাদ,

ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়া'কূব (আলাইহিমুস সালাম)-কে 'তাঁর উবুদিয়্যাত'-এর দিকে সম্পৃক্ত করেছেন। এমনিভাবে কা'বা এবং সালিহ (আলাইহিস সালাম)-এর উটকে তিনি নিজের দিকে সম্পর্কিত করেছেন ('বাইতুল্লাহ' ও 'নাকাতুল্লাহ)।

شَهْرُ الْحَرامِ مُبَارَكٌ مَّيْمُوْنُ *** وَالصَّوْمُ فِيْهِ مُضَاعَفٌ مَّسْنُوْنُ

وَثَوابُ صَابِمِهِ لِوَجْهِ إِلٰهِهِ *** فِي الْخُلْدِ عِنْدَ مَلِيْكِهِ مَخْزُوْنُ

হারাম মাস অনেক বরকতপূর্ণ ও সৌভাগ্যময়,
এতে রোযা রাখা সুন্নাহ, এতে প্রচুর নেকি হয়।
আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় রোযাদার তার প্রতিদান,
সংরক্ষিত পাবে আপন মালিকের কাছে অফুরান।

রোযা হলো বান্দা ও তার রবের মধ্যে একটি গোপন বিষয়। এ কারণেই (হাদীসে কুদসিতে এসেছে,) আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصَّوْمَ، فَإِنَّهُ لِيْ، وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ. وَفِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، لَا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَّا الصَّابِمُوْنَ، فَإِذَا دَخَلُوْا، أُغْلِقَ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ غَيْرُهُمْ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমল তার নিজের জন্য। তবে সিয়াম ব্যতীত, এটা কেবল আমার জন্য। সুতরাং আমিই এর প্রতিদান দেবো। কারণ সে শুধুমাত্র আমার সন্তুষ্টির আশায় তার যৌনচাহিদা, খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকে। জান্নাতে একটি দরজা আছে, যাকে বলা হয় 'রাইয়্যান'। এটি দিয়ে কেবল সিয়াম পালনকারীরাই প্রবেশ করবে। তাদের প্রবেশ করা যখন শেষ হয়ে যাবে, তখন তা বন্ধ করে দেওয়া হবে, ফলে সেই দরজা দিয়ে আর কেউ ঢুকতে পারবে না।"[৩১]

'মুসনাদু আহমাদ'-এ এসেছে, আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে বলেন, 'আমাকে উপদেশ দিন।' জবাবে তিনি বলেন,

عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ

[৩১] বুখারি, ১৮৯৬; মুসলিম, ১১৫২।

"নিজের ওপর সাওম অপরিহার্য করে নাও। কারণ এর সমকক্ষ আর কিছুই নেই।"[৩২]

এরপর থেকে আবূ উমামা (রদিয়াল্লাহু আনহু) এবং তাঁর পরিবারের লোকজন সাওম পালন করতে শুরু করেন। যদি দিনের বেলায় কখনো তাদের বাড়িতে ধোঁয়া দেখা যেত, তা হলে জানা যেত যে, তাদের ঘরে মেহমান এসেছে।

সিয়াম পালনকারীর জন্য দুটি খুশি রয়েছে : একটি হলো সিয়াম ভাঙার সময়, আরেকটি হলো তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়, যখন সে তার সিয়ামের প্রতিদান পাবে সংরক্ষিত।

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَالصَّابِمِيْنَ وَالصَّابِمَاتِ وَالْحَافِظِيْنَ فُرُوْجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٣٥﴾

"সিয়াম পালনকারী পুরুষ, সিয়াম পালনকারী নারী, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী পুরুষ, যৌনাঙ্গ হেফাজতকারী নারী, আল্লাহর অধিক যিক্‌রকারী পুরুষ ও অধিক যিক্‌রকারী নারী—তাদের সবার জন্য আল্লাহ প্রস্তুত করে রেখেছেন ক্ষমা ও মহাপুরস্কার।"[৩৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

كُلُوْا وَاشْرَبُوْا هَنِيْئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿٢٤﴾

"অতীতের দিনগুলোতে তোমরা যা করে এসেছে, তার বিনিময়স্বরূপ তোমরা তৃপ্তির সাথে খাও এবং পান করো।"[৩৪]

মুজাহিদ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ আরও অনেকেই বলেছেন, 'এটি নাযিল হয়েছে সিয়াম পালনকারীদের ব্যাপারে।'

যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য খাবার, পানীয় ও যৌনচাহিদা পূরণ করা থেকে বিরত

---

[৩২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ২২১৪৯; নাসাঈ, ২২২৩।

[৩৩] সূরা আহযাব, ৩৩ : ৩৫।

[৩৪] সূরা হাক্কাহ, ৬৯ : ২৪।

থাকবে, আল্লাহ তাআলা তাকে এর চেয়েও উত্তম বিনিময় দান করবেন, এমন খাবার ও পানীয় যা কখনো ফুরোবে না এবং এমন সব স্ত্রী, যারা কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।

যেহেতু সিয়াম বান্দা ও রবের মধ্যে একটি গোপন বিষয়, তাই মুখলিস বান্দারা খুব সতর্কতার সাথে তা গোপন রাখার চেষ্টা করেন, যাতে কেউ টের না পায়।

মনীষীদের কেউ একজন বলেছেন, 'আমাদের নিকট পৌঁছেছে যে, ঈসা (আলাইহিস সালাম) বলেছেন,

إِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَدْهُنْ لِحْيَتَهُ وَيَمْسَحْ شَفَتَيْهِ مِنْ دُهْنِهِ حَتَّى يَنْظُرَ إِلَيْهِ النَّاظِرُ فَيَظُنَّ أَنَّهُ لَيْسَ بِصَائِمٍ

> 'তোমাদের কেউ যখন সিয়াম পালন করবে, তখন সে যেন তার দাড়িতে তেল লাগায় এবং দুই ঠোঁটেও সামান্য তেল ছোঁয়ায়, যাতে যে তাকে দেখবে, সে যেন ধারণা করে যে, এই ব্যক্তি সিয়াম পালনকারী নয়।'[৩৫]

আবদুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রদিয়াল্লাহু আনহু) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ সিয়াম পালন করলে সে যেন চুলে চিরুনি করে এবং তেল লাগায়। ডান হাতে সদাকা করলে বাম হাত থেকেও যেন গোপন রাখে। আর নফল সালাত আদায় করলে যেন বাড়ির ভেতরে নির্জন কক্ষে তা আদায় করে।'

আবুত তাইয়্যাহ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি আমার পিতা এবং এলাকার অনেক শাইখদের পেয়েছি, যখন তাদের কেউ সিয়াম পালন করতেন, তেল ব্যবহার করতেন এবং নিজের সবচেয়ে সুন্দর পোশাকটি পরতেন।'

সালাফদের মধ্যে একজন চল্লিশ বছর যাবৎ সাওম রেখেছেন, কিন্তু কেউ তা জানতে পারেনি। তার একটি দোকান ছিল, প্রতিদিন তিনি বাড়ি থেকে দুটি রুটি নিয়ে দোকানে আসতেন; আর আসার পথে তা সদাকা করে দিতেন। ফলে তার পরিবারের লোকজন জানত, তিনি দোকানে গিয়ে রুটি খেয়ে নেন, অপরদিকে যারা দোকানে থাকত তারা ভাবত, তিনি বাড়ি থেকে আসার সময় খেয়েই আসেন।

---

[৩৫] ইবনু আবী শাইবা, আল-মুসান্নাফ, ৩৫৫৪৯; আহমাদ, কিতাবুয যুহ্দ, ৩১৬।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : তাহাজ্জুদের ফযীলত

পূর্বে বর্ণিত আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীস প্রমাণ করে যে, ফরজ সালাতের পর সর্বোত্তম সালাত হলো রাতের সালাত অর্থাৎ তাহাজ্জুদ।

তাহাজ্জুদ কি সুন্নাতে মুআক্কাদার চেয়েও উত্তম? এ ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

তবে দিনের সালাতের চেয়ে রাতের সালাত বেশি উত্তম ও মর্দাযাপূর্ণ হওয়ার কারণ হলো :

* তাতে গোপনীয়তা বজায় থাকে বেশি এবং তা ইখলাসের বেশ নিকটবর্তী হয়। সালাফগণ তাদের তাহাজ্জুদের সালাতকে লুকিয়ে রাখার এবং প্রকাশ না করার জন্য সাধ্যমতো চেষ্টা করতেন। হাসান বাস্‌রি (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এক ব্যক্তির নিকট এক মেহমান থাকত। তিনি রাতে জাগ্রত হয়ে সালাত আদায় করতেন; কিন্তু সেই মেহমান টের পেত না। তিনি দুআয় মশগুল থাকতেন, তবে তার কোনো আওয়াজ শোনা যেত না।'

মুহাম্মাদ ইবনু ওয়াসি' (রহিমাহুল্লাহ) মক্কা যাওয়ার পথে তার সাওয়ারিতে দীর্ঘ রাত পর্যন্ত সালাত আদায় করেন। তিনি তার চালককে বলে রেখেছিলেন জোরে জোরে কথা বলতে, যাতে মানুষজন তাতেই ব্যস্ত থাকে।

কেউ কেউ মধ্যরাতে জাগ্রত হয়ে ইবাদাতে মগ্ন হতেন, যা কেউ জানতে পারত না। তবে সুবহে সাদিকের কাছাকাছি সময়ে গিয়ে জোরে জোরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন, যাতে বোঝা যায় তিনি মাত্রই জেগে উঠেছেন।

* আরেকটি কারণ হলো : রাতের সালাত নফসের জন্য অনেক কষ্টদায়ক। কেননা রাত হলো দিনের ক্লান্তি থেকে আরাম করা এবং ঘুমানোর সময়। নফসের কাছে মজার ও আনন্দের যে ঘুম, তা পরিত্যাগ করা অনেক বড়ো মুজাহাদার ও অত্যন্ত কষ্টের। সালাফদের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, 'সর্বোত্তম আমল হলো যাতে নফসকে জোরজবরদস্তি ও বাধ্য করা হয়।'

* আরেকটি কারণ হলো : রাতের সালাতে যে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে গভীরভাবে চিন্তা করা সহজ হয়। কেননা রাতে সব রকমের ব্যস্ততা থেকে মানুষ মুক্ত থাকে, ফলে অন্তর উপস্থিত ও সতর্ক থাকে। মুখে যা উচ্চারণ করা হয়, খুব

সহজেই অন্তর তাতে একনিষ্ঠ হয় এবং দ্রুতই তা উপলব্ধি করে নেয়। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝٦

"প্রকৃতপক্ষে রাতের বেলা জেগে ওঠা, প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে অনেক বেশি কার্যকর এবং যথাযথভাবে কুরআন পড়ার উপযুক্ত সময়।"[৩৬]

এ কারণেই রাতের সালাতে তারতীলের সাথে কুরআন তিলাওয়াতের আদেশ দেওয়া হয়েছে।

* আরেকটি কারণ হলো : রাতে তাহাজ্জুদ আদায়ের সময়টি হলো নফল সালাত আদায় করার অন্যান্য সময়ের চেয়ে শ্রেষ্ঠ সময়। সেসময় বান্দা তার রবের খুব কাছাকাছি অবস্থান করে। এই সময়টি হলো আসমানের দরজাসমূহ উন্মুক্ত করা, দুআ কবুল করা এবং প্রার্থনাকারীদের বিভিন্ন প্রয়োজন উপস্থাপনের সময়।

আল্লাহ তাআলা সেই সমস্ত ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছেন, যারা তাঁর যিক্‌র, দুআ, ইসতিগফার ও তাঁর সাথে মুনাজাত করার জন্য জেগে ওঠে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝١٦ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝١٧

"তাদের পিঠ থাকে বিছানা থেকে আলাদা, তারা ভয় ও আশা নিয়ে নিজেদের রবকে ডাকে আর যে রিয্‌ক আমি তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করে। আসলে কেউ জানে না তাদের আমলের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য চোখ জুড়ানো কী লুকিয়ে রাখা হয়েছে?"[৩৭]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝١٧

---

[৩৬] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ৬।

[৩৭] সূরা সাজদা, ৩২ : ১৬-১৭।

"এবং তারা রাতের শেষভাগে আল্লাহর কাছে গুনাহ মাফের জন্য দুআ করে থাকে।"[৩৮]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

كَانُوْا قَلِيْلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُوْنَ ۝١٧ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ۝١٨

"রাতের বেলা তারা কমই ঘুমাত। তারা রাতের শেষ প্রহরগুলোতে ক্ষমা প্রার্থনা করত।"[৩৯]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ۝٦٤

"তারা রাত কাটিয়ে দেয় আপন প্রভুর সামনে সাজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে থেকে।"[৪০]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ

"(এ ব্যক্তির আচরণই সুন্দর, না সে ব্যক্তির আচরণ সুন্দর) যে অনুগত, রাতের বেলা দাঁড়ায় ও সাজদা করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং নিজের রবের রহমতের আশা করে? বলুন, 'যারা জানে আর যারা জানে না, তারা কি পরস্পর সমান হতে পারে?'"[৪১]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَّتْلُوْنَ آيَاتِ اللهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُوْنَ ۝١١٣

"আহলে কিতাবদের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে সত্য পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[৩৮] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১৭।
[৩৯] সূরা যারিয়াত, ৫১ : ১৭-১৮।
[৪০] সূরা ফুরকান, ২৫ : ৬৪।
[৪১] সূরা যুমার, ৩৯ : ৯।

তারা রাতে আল্লাহর আয়াত পাঠ করে এবং তাঁর সামনে সাজদাবনত হয়।"[৪২]

আল্লাহ তাআলা নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সম্বোধন করে বলেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسٰى أَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُوْدًا ﴿٧٩﴾

"আর রাতে তাহাজ্জুদ পড়ুন, এটি আপনার জন্য নফল। অচিরেই আপনার রব আপনাকে 'প্রশংসিত স্থানে' প্রতিষ্ঠিত করবেন।"[৪৩]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيْلًا ﴿٢٦﴾

"রাতের কিছু অংশে তাঁর উদ্দেশে সাজদা করুন এবং রাতের দীর্ঘ সময় তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করুন।"[৪৪]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেছেন,

يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيْلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيْلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ

"হে বস্ত্র মুড়ি দিয়ে শয়নকারী, রাতের বেলা সালাতে দাঁড়ান, তবে কিছু সময় ছাড়া; অর্ধেক রাত, কিংবা তার চেয়ে কিছু কম করুন অথবা তার ওপর কিছু বাড়িয়ে নিন।"[৪৫]

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এক ব্যক্তিকে বলেন, 'তুমি কিয়ামুল লাইল কখনো ছাড়বে না। কারণ আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা কখনো ছাড়েননি। যখন অসুস্থ হয়ে যেতেন (অথবা তিনি বলেছেন, অলসতা বোধ করতেন,) তখন বসে বসে পড়তেন।'[৪৬]

আরেকটি রিওয়ায়াতে এসেছে, আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) বলেছেন, 'এক সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার নিকট খবর পৌঁছেছে যে, তারা বলে, 'আমরা যদি ফরজ

---

[৪২] সূরা আ-ল ইমরান, ৩ : ১১৩।
[৪৩] সূরা ইসরা, ১৭ : ৭৯।
[৪৪] সূরা ইনসান, ৭৬ : ২৬।
[৪৫] সূরা মুযযাম্মিল, ৭৩ : ১-৪।
[৪৬] আবূ দাউদ, ১৩০৭; আহমাদ, ২৬১১৪।

আদায় করে ফেলি, তা হলে অধিক আমল না করলেও আমরা কোনো পরোয়া করি না'—আমার জীবনের শপথ, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কেবল ফরজ আমলের ব্যাপারেই জিজ্ঞাসা করবেন, কিন্তু তারা তো এমন কওম, যারা রাতে-দিনে ভুল করে থাকে। তোমরা তো তোমাদের নবির থেকেই আর তোমাদের নবিও তোমাদের থেকেই। আল্লাহর শপথ, আল্লাহ রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কিয়ামুল লাইল (তাহাজ্জুদ) ছাড়েননি।'

আয়িশা (রদিয়াল্লাহু আনহা) এর মাধ্যমে ইঙ্গিত প্রদান করেছেন যে, কিয়ামুল লাইলে বড়ো দুটি ফায়দা রয়েছে :

এক. রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাহ মোতাবিক চলা এবং তাঁর অনুসরণ করা; আল্লাহ তাআলা তো বলেছেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ।"[৪৭]

দুই. গুনাহ ও ভুলভ্রান্তির কাফফারা। কারণ আদম সন্তান দিনে-রাতে গুনাহ করে, ভুলভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, ফলে সেগুলোর কাফফারা বা দূর করার দিকেও প্রয়োজন পড়ে বেশি। আর কিয়ামুল লাইল বা রাতের সালাত হলো গুনাহ মোচন করার দিক দিয়ে সবচেয়ে বড়ো। যেমন মুআয ইবনু জাবাল (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

قِيَامُ الْعَبْدِ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ يُكَفِّرُ الْخَطِيْئَةَ

"রাতের মধ্যাংশে (সালাতে) বান্দার কিয়াম করা গুনাহকে মিটিয়ে দেয়।"

অতঃপর তিনি তিলাওয়াত করেন,

تَجَافٰى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ...

"তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে,..." (সূরা সাজদা, ৩২ : ১৬)[৪৮]

---

[৪৭] সূরা আহযাব, ৩৩ : ২১।

[৪৮] আহমাদ, ২২০১৬; তিরমিযি, ২৬১৬।

রমাদান মাসের আমল

নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কেরামকে রমাদান মাস আসার সুসংবাদ দিতেন; যেমন *মুসনাদু আহমাদ* ও *সুনানু নাসাঈ*-এর বর্ণনায় এসেছে, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবিদের সুসংবাদ দিয়ে বলতেন,

قَدْ جَاءَكُمْ رَمَضَانُ، شَهْرٌ مُّبَارَكٌ، افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمْ صِيَامَهُ، تُفْتَحُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، وَتُغْلَقُ فِيْهِ أَبْوَابُ الْجَحِيْمِ، وَتُغَلُّ فِيْهِ الشَّيَاطِيْنُ، فِيْهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، مَنْ حُرِمَ خَيْرَهَا، فَقَدْ حُرِمَ

> "রমাদান মাস তোমাদের নিকট চলে এসেছে, মুবারক মাস। আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর এই মাসের রোযা রাখা ফরজ করেছেন। এই মাসে জান্নাতের সমস্ত দরজা খুলে দেওয়া হয় আর জাহান্নামের সব দরজা বন্ধ করে রাখা হয় এবং সমস্ত শয়তানকে বন্দি করা হয়। এই মাসে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাস থেকেও শ্রেষ্ঠ। যে ব্যক্তিকে এই মাসের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত রাখা হয়, সে সত্যিই বঞ্চিত।"[১]

কিছু আলিম বলেছেন, 'এই হাদীসটি হলো রমাদান মাস সম্পর্কে একে অপরকে অভিনন্দন জানানোর ভিত্তি। আর কীভাবেই-বা মুমিনকে জান্নাতের দরজা খোলার ব্যাপারে সুসংবাদ দেওয়া হবে না? এবং গুনাহগারকে জাহান্নামের দরজা বন্ধের ব্যাপারে খোশখবর দেওয়া হবে না? আর গাফিলদেরকে কীভাবেই-বা সেই সময় সম্পর্কে সুসংবাদ দেওয়া হবে না, যখন শয়তানকে বন্দি করে রাখা হয়? সেই

[১] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ৭১৪৮; নাসাঈ, ২১০৬।

সময়ের সাথে কি আর কোনো সময়ের তুলনা হয়?

রমাদান মাস পর্যন্ত পৌঁছা এবং পুরা মাস জুড়ে রোযা রাখা, সক্ষম ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ তাআলার অনেক বড়ো অনুগ্রহ। এর ওপর প্রমাণ বহন করে তিন ব্যক্তির সেই হাদীস, যাদের মধ্যে দুজন শহীদ হয়ে যায়, তারপর তৃতীয় ব্যক্তি মারা যায় নিজের বিছানায়। কিন্তু স্বপ্নে তাকেই দেখা যায় অপর দুজনের চেয়ে অগ্রবর্তী। এর কারণ হিসেবে নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أَلَيْسَ صَلَّى بَعْدَهُمَا كَذَا وَكَذَا صَلَاةً وَأَدْرَكَ رَمَضَانَ فَصَامَهُ؟ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ بَيْنَهُمَا لَأَبْعَدَ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

> "সে কি তাদের দুজনের পরে এত এত সালাত আদায় করেনি? রমাদান মাস পায়নি এবং তাতে সিয়াম পালন করেনি? সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! নিশ্চয় তাদের মাঝে রয়েছে আসমান ও জমিন পরিমাণ দূরত্বের ব্যবধান।"[২]

যে ব্যক্তি রমাদান মাস পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়, সে-ই প্রকৃত বঞ্চিত। আর যে ব্যক্তি রমাদান মাস পেয়েও এর কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সে যেন সমস্ত কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত হয়। আর যে ব্যক্তি নিজের আখিরাতের জন্য এই মাসে পাথেয় সংগ্রহ করতে পারে না, সে হলো নিন্দিত ও তিরস্কৃত।

أَتَى رَمَضَانُ مَزْرَعَةُ الْعِبَادِ *** لِتَطْهِيْرِ الْقُلُوْبِ مِنَ الْفَسَادِ

فَأَدِّ حُقُوْقَهُ قَوْلًا وَّفِعْلًا *** وَزَادَكَ فَاتَّخِذْهُ لِلْمَعَادِ

فَمَنْ زَرَعَ الْحُبُوْبَ وَمَا سَقَاهَا *** تَأَوَّهَ نَادِمًا يَّوْمَ الْحَصَادِ

রমাদান মাস এসেছে, যা বান্দাদের জন্য শস্যক্ষেত্র,
যা ফিতনা-ফাসাদ থেকে অন্তরকে রাখবে পবিত্র।
তাই কথা ও কর্ম দিয়ে এর হকগুলো করো আদায়,
পরকালের সম্বল বানাও, যেদিন থাকবে না উপায়।
যে বীজ বপন করে, কিন্তু নিয়মিত তা করে না সিক্ত,

[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪০৩; ইবনু মাজাহ, ৩৯২৫।

ফসল কাটার দিন সে করবে হায় হায়, হবে অনুতপ্ত।

ওহে দীর্ঘদিন ধরে আমল থেকে অনুপস্থিত ব্যক্তি, নেক আমল করার সময় যে ঘনিয়ে আসছে! ওহে প্রলম্বিত ক্ষতির অধিকারী, লাভজনক ব্যবসা করার দিন যে নিকটবর্তী হচ্ছে!

যে ব্যক্তি এই মাসে লাভ কামাতে পারবে না, সে আর কোন সময়ে লাভ কামাবে? যে ব্যক্তি এই মাসে তার রবের নিকটবর্তী হতে পারে না, তাঁর থেকে সে কেবল দূরেই সরে যেতে থাকে।

কতবার ডাকা হলো, 'কল্যাণের দিকে আসো' অথচ তুমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েই রইলে! কতবার তোমাকে ডাকা হলো, 'সালাতের দিকে আসো' অথচ তুমি ফাসাদের ওপরই অনড় থাকলে!

إِذَا رَمَضَانُ أَتَى مُقْبِلًا *** فَأَقْبِلْ فَبِالْخَيْرِ يُسْتَقْبَلُ

لَعَلَّكَ تُخْطِئُهُ قَابِلًا *** وَتَأْتِيْ بِعُذْرٍ فَلَا يُقْبَلُ

পবিত্র রমাদান মাস সামনে অগ্রসর হবে যখন,
তুমিও অগ্রসর হোয়ো, কল্যাণকে কোরো বরণ।
যদি তুমি রমাদানকে স্বাগত জানাতে করো ভুল
আর দেখাও অজুহাত, তবে তা হবে না কবুল।

কত মানুষ আছে যারা আশা রাখে যে, এবার পুরা মাস জুড়ে রোযা রাখবে; কিন্তু তাদের আশা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। রমাদান মাস আসার আগেই তাদের ঠিকানা হয় কবরের অন্ধকারে।

উমর ইবনু আবদিল আযীয (রহিমাহুল্লাহ) তার জীবনের সর্বশেষ খুতবায় বলেন, 'তোমাদেরকে অনর্থক সৃষ্টি করা হয়নি এবং তোমাদেরকে শুধু শুধু ছেড়েও দেওয়া হয়নি। তোমাদের জন্য রয়েছে নির্ধারিত সময়, যখন আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবেন। সেই ব্যক্তি লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে, যে আল্লাহর রহমত থেকে বের হয়ে যাবে; যেই রহমত সমস্ত বস্তু পর্যন্ত বিস্তৃত এবং জান্নাত থেকে যে বঞ্চিত হবে; যার প্রশস্ততা আসমান-জমিন জুড়ে। তোমরা কি নিজেদেরকে ধ্বংসশীলদের মধ্য গণ্য করছো না? তোমাদের পরে অচিরেই

অন্যান্যরা এর উত্তরাধিকারী হবে, অবশেষে উত্তম ওয়ারিশদের নিকট তা ফিরিয়ে দেওয়া হবে! প্রতিদিনই অনেককেই তোমরা সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর দিকে বিদায় জানাচ্ছ, যারা মৃত্যুবরণ করেছে এবং নিজেদের সময় শেষ করেছে। তোমরা তাদেরকে মাটির গর্তে রেখে আসছো কোনো বিছানা-বালিশ দেওয়া ছাড়াই! তারা সব আসবাব-উপকরণ, প্রিয়জন থেকে পৃথক হয়ে যাচ্ছে, বসবাস করছে মাটির ঘরে আর অপেক্ষা করছে হিসাবের। যা পেছনে রেখে যাচ্ছে তাতে তো তারা ধনী ছিল, কিন্তু যা পাঠিয়ে দিয়েছে তাতে তারা ফকীর। সুতরাং আল্লাহর বান্দা, মৃত্যু আসার আগেই এবং জীবনকাল ফুরিয়ে যাবার পূর্বেই আল্লাহকে ভয় করো! আমি তোমাদেরকে এই কথাগুলো বলছি, আসলে আমার নিকট যে পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, তা আর কারও কাছে আছে কি না আমার জানা নেই। তবে আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তাওবা করি।' এরপর তিনি তার চাদরের খানিকাংশ ওপরে উঠান এবং কান্না করেন এবং একসময় চিৎকার দিয়ে ওঠেন। এরপর মিম্বার থেকে নামেন, তারপর তিনি আর মিম্বারে কখনো ফিরে যাননি, অবশেষে মৃত্যুবরণ করেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

প্রথম মাজলিস : সিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে

সহীহাইন-এর বর্ণনায় এসেছে, আবূ হুরায়রা (রদিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، اَلْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ، إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ عِنْدَ اللهِ أَطْيَبُ مِنْ رِّيْحِ الْمِسْكِ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার নিজের জন্য। একটি আমল দশগুণ থেকে সাতশগুণ পর্যন্ত (বৃদ্ধি করা হয়)। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তবে রোযা ব্যতীত, কারণ তা আমার জন্য এবং আমিই এর প্রতিদান দেবো। কেননা বান্দা আমার জন্যই তার চাহিদা, খাবার ও পানীয় ত্যাগ করেছে। সিয়াম পালনকারীর জন্য দুইটি আনন্দ রয়েছে, একটি আনন্দ তার ইফতারের সময়

এবং আরেকটি আনন্দ তার রবের সাথে সাক্ষাতের সময়। সিয়াম পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট মিশ্‌কের ঘ্রাণের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময়।"[১]

অন্য বর্ণনায় এসেছে,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ، إِلَّا الصِّيَامَ، فَإِنَّهُ لِيْ

"আদম সন্তানের প্রতিটি আমলই তার নিজের জন্য, কেবল রোযা ব্যতীত; কারণ তা আমার জন্য।"[২]

সহীহ বুখারি-এর আরেকটি বর্ণনায় এসেছে,

لِكُلِّ عَمَلٍ كَفَّارَةٌ وَّالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا الَّذِيْ أَجْزِيْ بِهِ

"প্রতিটি আমলের কাফফারা রয়েছে। কিন্তু সাওম আমার জন্যই আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।"[৩]

মুসনাদু আহমাদ-এর বর্ণনায় এসেছে,

كُلُّ عَمَلِ ابْنِ آدَمَ لَهُ كَفَّارَةٌ إِلَّا الصَّوْمَ وَالصَّوْمُ لِيْ وَأَنَا أَجْزِيْ بِهِ

"আদম সন্তানের নিজের প্রতিটি আমলের কাফফারা রয়েছে, কেবল সাওম ব্যতীত। সাওম শুধু আমার জন্যই আর আমি নিজেই এর প্রতিদান দেবো।"

কারণ সাওম হলো সবরের অংশ। আর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿٣٠﴾

"সবরকারীদের অগণিত পুরস্কার দেওয়া হবে।"[৪]

সবর তিন প্রকার :

১. আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর,

২. আল্লাহর হারামকৃত বস্তু থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর এবং

---

[১] বুখারি, ১৯০৪; মুসলিম, ১১৫১; ইবনু মাজাহ, ১৬৩৮।

[২] মুসলিম, ১১৫১।

[৩] বুখারি, ৭৫৩৮।

[৪] সূরা যুমার, ৩৯ : ১০।

৩. তাকদীরের কষ্টকর বিষয়ের ওপর সবর।

রোযা এই তিন প্রকার সবরকেই অন্তর্ভুক্ত করে। কারণ রোযার মধ্যে আল্লাহর আনুগত্যের ওপর সবর রয়েছে, রোযাদার ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকার ওপর সবর রয়েছে। এমনিভাবে রোযাদার ক্ষুধা, পিপাসা, নফস ও শরীর দুর্বল হওয়ার যে কষ্ট পায়, তার ওপর তার সবর রয়েছে।

নেককাজ করতে গিয়ে যে কষ্ট ও ব্যথা অনুভূত হয়, তার বিনিময়ে বান্দাকে সাওয়াব দান করা হয়। যেমন আল্লাহ তাআলা জিহাদকারীদের সম্পর্কে বলেছেন,

ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَّلَا نَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ۚ إِنَّ اللهَ لَا يُضِيْعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٢٠﴾

"কারণ আল্লাহর পথে তারা যখনই ক্ষুধা-তৃষ্ণা ও শারীরিক কষ্ট ভোগ করে, যখনই এমন পথ অবলম্বন করে, যা কাফিরদের ক্রোধ বাড়িয়ে দেয় এবং যখনই কোনো শত্রুর বিরুদ্ধে তারা সফলতা অর্জন করে, তৎক্ষনাৎ তার বদলে তাদের জন্য একটি সৎকাজ লেখা হয়। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের কোনো পরিশ্রম বিফলে যেতে দেন না।"[৫]

জেনে রাখুন, আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পাওয়ার অনেকগুলো কারণ রয়েছে :

* আমল করার স্থান মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়; যেমন: হারাম শরীফ।

এই কারণেই মক্কা ও মদীনার দুই মসজিদে সালাত আদায়ের সাওয়াব বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সহীহ হাদীসের মাধ্যমেই বিষয়টি প্রমাণিত; নবি (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

صَلَاةٌ فِيْ مَسْجِدِيْ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

"আমার এ মসজিদে (নববিতে) এক (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করা অন্যান্য মসজিদে এক হাজার (ওয়াক্ত) সালাত আদায় করার চেয়ে উত্তম, তবে

[৫] সূরা তাওবা, ৯ : ১২০।

মসজিদে হারাম এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।"[১]

এক রিওয়ায়াতে এসেছে, فَإِنَّهُ أَفْضَلُ "কারণ মসজিদে হারাম সর্বোত্তম মসজিদ।"

* সময় মর্যাদাপূর্ণ হওয়ার কারণে আমলের সাওয়াব বৃদ্ধি পায়; যেমন : রমাদান মাস, যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম ১০ দিন।

আরও বিভিন্ন কারণে আমলের সাওয়াব বাড়িয়ে দেওয়া হয়; তার মধ্যে একটি হলো: আমলকারী আল্লাহর নিকট মর্যাদাশীল, নৈকট্যপ্রাপ্ত এবং অধিক তাকওয়ার অধিকারী হওয়ার কারণে। যেমন এই উম্মাহর সাওয়াব পূর্ববর্তী অন্যান্য উম্মাহর চেয়ে বহুগুণ বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এই উম্মাহকে দ্বিগুণ পুরস্কারে পুরস্কৃত করা হয়েছে।

রোযার ফযীলত সম্পর্কিত হাদীসে فَإِنَّهُ لِي "কারণ তা আমার জন্য" এসেছে; এখানে আল্লাহ তাআলা অন্যান্য আমল বাদ দিয়ে রোযাকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন, এর অর্থ সম্পর্কে অনেক ব্যাখ্যাই রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম যে ব্যাখ্যা, সেখানে দুইটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে—

প্রথম দিক : রোযা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নফস ও প্রবৃত্তির মূল চাহিদা পরিত্যাগ করা, যেগুলোর দিকে মানুষ স্বভাবগতভাবেই অধিক আকর্ষণ বোধ করে। আর এই বিষয়টি রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদাতে পাওয়া যায় না। কারণ ইহরামের ক্ষেত্রে শুধু সহবাস এবং এর আনুষঙ্গিক কিছু বিষয় পরিত্যাগ করতে হয়; খাদ্য ও পানীয়ের ক্ষেত্রে কোনো নিষেধাজ্ঞা নেই। এমনিভাবে ই'তিকাফের ক্ষেত্রেও, আবার ই'তিকাফ হলো রোযার অধীন।

সালাতের ক্ষেত্রে সালাত আদায়ের সময়টুকু সব ধরনের চাহিদা থেকে বিরত থাকতে হয়। তবে এর সময় বেশ প্রলম্বিত নয়। ফলে সালাত আদায়কারী সালাতের সময় খাদ্য ও পানীয়ের খুব একটা অভাববোধ করে না। বরং খাবার সামনে রেখে ক্ষুধার্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে; এ ক্ষেত্রে আদেশ হলো খাবার খেয়ে স্বস্তির সাথে সালাত আদায় করবে। এই কারণেই রাতের খাবার খাওয়ার পরে ইশার নামাজ পড়ার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একদল উলামায়ে কেরাম তো বলেছেন নফল নামাজে পানি পান করা বৈধ। ইবনুয যুবাইর (রহিমাহুল্লাহ) নফল

[১] বুখারি, ১১৯০; মুসলিম, ১৩৯৪।

নামাজে এরকম করতেন। এর স্বপক্ষে ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বাল (রহিমাহুল্লাহ)-এর একটি অভিমত বর্ণিত আছে। রোযার ক্ষেত্রে এর বিপরীত। কারণ পুরো দিন জুড়েই তা বিস্তৃত। সুতরাং রোযাদার ব্যক্তি দীর্ঘসময় ধরে তার চাহিদাগুলো পূরণের তাড়না অনুভব করে এবং তার নফস সেদিকে ধাবিত হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মের দিনে। প্রচণ্ড গরম ও দিন বড়ো হওয়ার কারণে। এই কারণে বর্ণনা করা হয় যে, খাঁটি ঈমানের বৈশিষ্ট্য হলো গ্রীষ্মকালে রোযা রাখা।

নফস যা চায়, তার প্রতি যখন আগ্রহ খুব বেড়ে যায় এবং তাতে লিপ্ত হওয়ার সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যখন আল্লাহর ভয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টির আশায় তা পরিত্যাগ করে, তাও আবার এমন বিষয়ে যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানেন না, তা হলে তা তার বিশুদ্ধ ঈমানের দলীল হিসাবে প্রমাণ বহন করে। কারণ সিয়াম পালনকারী ব্যক্তি জানে যে, তার একজন রব রয়েছেন, যিনি তার নির্জনতা সম্পর্কেও অবগত; ফলে সে নিজের ওপর তার রবের আদেশ অমান্য করা হারাম করে নিয়েছে, রবের শাস্তির ভয়ে এবং তাঁর প্রতিদানের প্রতি আগ্রহী হয়ে। এই কারণে আল্লাহ তাআলা তা কবুল করে নিয়েছেন, অন্য সব আমলকে বাদ দিয়ে রোযার আমলকে নিজের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন এবং এর পরে বলেছেন,

إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي

> "কেননা বান্দা আমার জন্যই তার যৌনচাহিদা, খাবার ও পানীয় ত্যাগ করেছে।"[২]

পূর্ববর্তী মনীষীদের কেউ কেউ বলেছেন, 'সেই ব্যক্তির জন্য সুসংবাদ, যে বর্তমানের চাহিদা ছেড়ে দিয়েছে ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতির জন্য, যা সে দেখেনি।'

যখন সিয়াম পালনকারী মুমিন জানবে যে, তার রবের সন্তুষ্টি রয়েছে তার নফসের চাহিদাগুলো পরিত্যাগ করার মধ্যে, তখন সে তার নিজের চাহিদার ওপর তার রবের সন্তুষ্টিকে প্রাধান্য দেবে। একসময় আল্লাহর জন্য নিজের প্রবৃত্তির চাহিদা ত্যাগ করার মধ্যেই সে বেশি আনন্দ পাবে, নির্জনে সেগুলো ভোগ করার চেয়ে; কারণ সে বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ তার সবকিছু অবগত রয়েছেন এবং এর ওপরই রয়েছে তাঁর শাস্তি ও সাওয়াব। এগুলো সে করবে আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের

[২] বুখারি, ১৯০৪; মুসলিম, ১১৫১; ইবনু মাজাহ, ১৬৩৮।

প্রবৃত্তির চাহিদার ওপর প্রাধান্য দিতে গিয়ে।

যখন সাওমের কারণে খাবার খাওয়া, পান করা এবং স্ত্রী-সহবাস করা হারাম করা হয়েছে, তখন অবৈধভাবে সেগুলোর স্বাধ নেওয়া আরও বেশি গুরুতর হারাম হবে এটাই স্বাভাবিক।

যেমন : ব্যভিচার করা, মদপান করা, অন্যায়ভাবে অপরের মাল বা জিনিসপত্র ছিনিয়ে নেওয়া, হারাম রক্তপাত ঘটানো ইত্যাদি। কারণ এগুলো সব সময় সর্বাবস্থায় এবং সব জায়গায় আল্লাহ তাআলাকে রাগান্বিত করে। সুতরাং যখন কোনো মুমিনের ঈমান পরিপূর্ণ হয়, তখন সে এই সব গুনাহকে নিজের হত্যা ও আঘাত পাওয়া থেকেও বেশি অপছন্দ করে।

এই কারণেই রাসূলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঈমানের মিষ্টতা অনুভব করার নিদর্শন হিসেবে উল্লেখ করেছেন—

أَنْ يَّكْرَهَ أَنْ يَّعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُّقْذَفَ فِي النَّارِ

> "সে কুফরে ফিরে যাওয়াকে আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতো অপছন্দ করবে।"[৩]

ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) বলেছিলেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُوْنَنِيْ إِلَيْهِ

> "হে আমার রব, এরা আমাকে যে দিকে আহ্বান করছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে প্রিয়।"[৪]

দ্বিতীয় দিক : রোযা হলো বান্দা ও তার রবের মাঝে একটি গোপন বিষয়; যা আর কেউ জানতে পারে না। কারণ রোযা সংঘটিত হয় গোপন নিয়তের মাধ্যমে, যা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অবগত হতে পারে না, এমনিভাবে নফসের তিন চাহিদা পরিত্যাগ করার মাধ্যমে, যা সাধারণত গোপনেই করা হয়। এই কারণে বলা হয়, 'রোযা এমন একটি আমল, যা পাহারাদার ফেরেশতারাও লিখে রাখে না।' বলা

[৩] বিস্তারিত দেখুন—বুখারি, ১৬; মুসলিম, ৪৩।

[৪] সূরা ইউসুফ, ১২ : ৩৩।

হয়, 'রোযার মধ্যে কোনো রিয়া থাকে না।' এমনটিই বলেছেন ইমাম আহমাদ (রহিমাহুল্লাহ)-সহ আরও অনেকেই।

(হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,)

إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِيْ

"কেননা বান্দা আমার জন্যই তার যৌনচাহিদা, খাবার ও পানীয় ত্যাগ করেছে।"[৫]

আমরা যা উল্লেখ করলাম, হাদীসের এই বাণীতে তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে এবং এর প্রতিও ইঙ্গিত রয়েছে যে, রোযাদার ব্যক্তি নিজের নফসের সবচেয়ে বড়ো চাহিদা—খাবার খাওয়া, পান করা ও স্ত্রী-সহবাস করা থেকে বিরত থেকে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করে।

রোযা রাখার দ্বারা এই তিনটি চাহিদা থেকে বিরত থাকার মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করার মধ্যে অনেকগুলো উপকারিতা ও কল্যাণ রয়েছে। তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. নফস দুর্বল হওয়া; কারণ পেট ভরে খাওয়া, তৃপ্তিসহ পান করা এবং স্ত্রী-সহবাস করা নফসকে অশ্লীল কাজ করতে, অহংকার করতে এবং গাফলত ও অমনোযোগিতার মধ্যে থাকতে উদ্‌বুদ্ধ করে।

২. যিক্‌র ও চিন্তাভাবনা করার জন্য অন্তর খালি হয়; কারণ এই তিন চাহিদা ও খাহেশাত পূরণ করার কারণে অন্তর কঠিন হয়, অন্ধকারে ছেয়ে যায়, বান্দার মাঝে এবং আল্লাহর স্মরণ ও চিন্তাভাবনা করার মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্তরে অমনোযোগিতা ও গাফলত আনে। খাওয়া ও পান করা থেকে অভ্যন্তরীণ অবস্থা খালি হলে কলব আলোকিত হয় এবং তাতে অন্তর্দৃষ্টি সৃষ্টি হয়, কাঠিন্য দূর করে আর যিক্‌র ও চিন্তাভাবনা করতে সাহায্য করে।

৩. ধনী ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা প্রাচুর্যের যে নিয়ামাত দান করেছেন—খাবার, পানীয় ও স্ত্রী, সেই নিয়ামাতগুলোর মর্যাদা সে উপলব্ধি করতে পারে, যা অনেক দরিদ্র মানুষকে দান করা হয়নি। সুতরাং রোযা রাখার মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট

[৫] বুখারি, ১৯০৪; মুসলিম, ১১৫১; ইবনু মাজাহ, ১৬৩৮।

যুল-হিজ্জাহ মাসের আমল

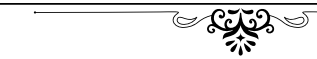

যুল-হিজ্জাহ মাসের আমল সম্পর্কে আলোচনায় কয়েকটি মাজলিস রয়েছে :

প্রথম মাজলিস : যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত

সহীহ বুখারি-এর বর্ণনায় এসেছে, আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هٰذِهِ الْأَيَّامِ

"এই দিনগুলোর (অর্থাৎ যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের) চাইতে অন্যান্য দিনে ভালো কাজ করা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় নয়।"

সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?"

তিনি বললেন,

وَلاَ الْجِهَادُ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ يُخَاطِرُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ

"আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে যে লোক নিজের জীবন ও সম্পদ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে, এরপর আর কোনোটাই নিয়ে ফিরে আসেনি, (শহীদ হয়ে

গিয়েছে,) তার বিষয়টি ভিন্ন।"[১]

দুটি পরিচ্ছেদে যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের ফযীলত-সংক্রান্ত আলোচনা করা হবে। প্রথম পরিচ্ছেদ হলো : এই দশদিনে আমল করার মর্যাদা। উপরিউক্ত হাদীসটিও এর প্রতি ইঙ্গিত করে। আর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ হলো : যুল-হিজ্জাহ মাসের মর্যাদা।

প্রথম পরিচ্ছেদ : যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনে আমলের ফযীলত

উপরিউক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, অন্যান্য মাসে আমল করার চাইতে যুল-হিজ্জাহ মাসের এই দিনগুলোতে আমল করা আল্লাহর নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয়। আল্লাহর নিকট যখন সর্বাধিক পছন্দনীয়, তখন সেটা তাঁর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণও বটে। আর হাদীসের ভাষ্য হলো, "যেকোনো দিনে আমল করা এই (যুল-হিজ্জাহর) দশদিনের আমলের চাইতে উত্তম নয়।" তবে কিছু বর্ণনায় এসেছে "সর্বাধিক পছন্দনীয়" আর কোনো বর্ণনায় এসেছে "সবচেয়ে উত্তম"—এই শব্দে একটু দ্বিধার সাথে।

যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিন আমল করা যখন আল্লাহ তাআলার নিকট বছরের অন্যান্য সময়ে আমল করার চেয়ে সর্বাধিক প্রিয় ও পছন্দনীয়, তখন এর মধ্যে অনুত্তম আমল করাও অনেক মর্যাদাপূর্ণ; অন্যান্য মাসে উত্তম আমল করার চেয়ে।

এ জন্যই সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করেছেন, 'আল্লাহর পথে জিহাদও কি নয়?' তিনি বলেছেন, "না, জিহাদও নয়।"

তবে এরপর তিনি একটি জিহাদকে বাদ রেখেছেন। সেটা হলো সর্বোত্তম জিহাদ। কারণ একবার আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট জানতে চাওয়া হলো, 'কোন জিহাদ উত্তম?' তিনি বললেন, "যার দ্রুতগামী ঘোড়া বধ হয়েছে এবং যার রক্ত প্রবাহিত হয়েছে।"[২] (অর্থাৎ যে শহীদ হয়ে গিয়েছে।) এই মুজাহিদ আল্লাহর নিকট সর্বাধিক মর্যাদার অধিকারী। আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক লোককে দুআ করতে শুনলেন, লোকটি বলছে, "হে

[১] বুখারি, ৯৬৯; আবূ দাউদ, ২৪৩৮।

[২] আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৪২৩৩।

আল্লাহ, তোমার পুণ্যবান বান্দাদেরকে তুমি যা দান করেছ, এর উত্তমটা আমাকে দান করো।" তখন তিনি বললেন, "তা হলে তো তোমার দ্রুতগামী ঘোড়া নিহত হবে এবং তুমিও শহীদ হবে।"[৩] এই বিশেষ জিহাদই যুল-হিজ্জাহ মাসের আমলের চাইতে উত্তম।

আর অন্যান্য জিহাদের চাইতে যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশ দিনের আমলই আল্লাহর নিকট উত্তম ও সর্বাধিক পছন্দনীয়। এমনিভাবে অন্য সকল আমলের চাইতেও যুল-হিজ্জাহ মাসের আমল উত্তম।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীসে আরও অতিরিক্ত বর্ণনা রয়েছে, "এই দিনগুলোয় আমল করলে সাতশগুণ বেশি পুণ্য লাভ হয়।" তবে এর সূত্রে দুর্বলতা রয়েছে।

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর হাদীস দ্বারা এও প্রমাণিত হয় যে, কোনো ধরনের ব্যতিক্রম ছাড়াই যুল-হিজ্জাহ মাসের দশদিনের সকল ভালো কাজে বহুগুণ পুণ্য লাভ হয়।

এই দশ দিনে অন্যতম নেক আমল : সিয়াম পালন করা

ইবনু সীরীন (রহিমাহুল্লাহ) 'দশ দিন সিয়াম পালন' বলাকে অপছন্দ করতেন। কারণ এই সন্দেহ সৃষ্টি হয় যে, এতে ঈদের দিনও অন্তর্ভুক্ত। তাই এভাবে বলা যায়, 'নয় দিন সিয়াম পালন'। তবে এখানে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। কারণ এখানে যখন দশটি সিয়ামের কথা বলা হয়, তখন এটাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে যে, এখানে সিয়াম রাখার বৈধ দিনগুলোকে বোঝানো হয়েছে।

আর এই দশ রাত জেগে ইবাদাত করা মুস্তাহাব। যখন এই দশদিন শুরু হয়ে যেত, তখন সাঈদ ইবনু যুবাইর (রদিয়াল্লাহু আনহু) অনেক বেশি ইবাদাত করতেন। তার থেকে বর্ণনা করা হয়, তিনি বলতেন, 'তোমরা এই দশ রাতে তোমাদের প্রদীপ নিভিয়ো না।" তিনি এই দিনগুলোর ইবাদাতে অনেক বেশি আনন্দিত হতেন।

এই দিনগুলোতে বেশি বেশি আল্লাহর যিক্‌র করা মুস্তাহাব। কুরআনে রয়েছে,

وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِيْ أَيَّامٍ مَّعْلُوْمَاتٍ

[৩] ইবনু খুযাইমা, ৪৫৩; ইবনু হিব্বান, ৪৬৪০।

"তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে যেন তারা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[৪]

এখানে নির্দিষ্ট দিনগুলো বলতে যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশদিনকেই বোঝানো হয়েছে। এটিই অধিকাংশ আলিমের অভিমত।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : অন্যান্য মাসের দশকের ওপর যুল-হিজ্জাহ মাসের দশকের শ্রেষ্ঠত্ব

আবদুল্লাহ ইবনু উমর (রদিয়াল্লাহু আনহুমা)-এর মারফূ হাদীস পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে যে, "এই দশদিন ছাড়া অন্য কোনো দিনে আমল করা আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন ও অধিক পছন্দনীয় নয়।"

আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

"শপথ দশ রাত্রির।"[৫]

এ-আয়াতের ব্যাখ্যায় মাসরূক (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'এই দিনগুলোই বছরের সেরা।'

তাছাড়া এই দিনগুলোতেই রয়েছে আরাফার দিন। বর্ণিত আছে, আরাফার দিন পৃথিবীর সর্বোত্তম দিন। জাবির (রদিয়াল্লাহু আনহু)-এর হাদীসেও এমনটা রয়েছে। পূর্বে এর আলোচনা করেছি।

আর এই রাতগুলোতে ইবাদাতের বিষয়ে, পরবর্তীগণের কারও মতে, রমাদানের শেষ দশরাত্রি অন্য সকল রাতের তুলনায় উত্তম। কারণ তাতে লাইলাতুল কদর রয়েছে। তবে এটি অনেক দূরবর্তী ব্যাখ্যা।

সঠিক অভিমত হলো, পরবর্তী কয়েকজন যুগশ্রেষ্ঠ উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো : যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশদিন রমাদানের শেষ দশদিনের চেয়েও উত্তম, যদিও রমাদানের দশদিনের মধ্যে এমন রাত রয়েছে, যেটার ওপর অন্য কোনো রাতের

[৪] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৮।

[৫] সূরা ফজর, ৮৯ : ২।

মর্যাদা হয় না। আল্লাহ তাআলাই অধিক জানেন।

যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশ দিনের আরও কিছু ফযীলত

পূর্বে যেসব ফযীলতের আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও যুল-হিজ্জাহ মাসের প্রথম দশদিনের আরও কিছু ফযীলত রয়েছে। সেগুলো হলো :

১. আল্লাহ তাআলা কখনো এই দিনগুলোর সার্বিকভাবে এবং কখনো দিনের বিশেষ কিছু সময়ের শপথ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে বলেছেন,

وَٱلْفَجْرِ ۝١ وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۝٢

"শপথ ঊষার! শপথ দশ রাত্রির!"[৬]

এখানে দশ রাত্রি বলতে যুল-হিজ্জাহর দশদিনকেই বোঝানো হয়েছে। এটিই বিশুদ্ধ অভিমত। পূর্বসূরী ও অন্যান্য তাফসীর বিশারদগণের অধিকাংশের অভিমতও এটিই।

২. এটি হলো হাজ্জের মাসগুলোর শেষ সময়। আল্লাহ তাআলা যেগুলো সম্পর্কে বলেছেন,

ٱلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ۚ

"হাজ্জের মাসগুলো সকলেরই জানা।"[৭]

আর তা হলো : শাওয়াল, যুল-কা'দাহ এবং যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশ দিন।

৩. এই দশ দিন হলো আল্লাহর নির্ধারিত কতগুলো দিন; যেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা এই হুকুম দিয়েছেন যে, মানুষকে তিনি চতুষ্পদ জন্তু থেকে যা জীবিকা হিসেবে দান করেছেন, তার ওপর তারা যেন আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে (এবং তা জবাই করে ভোগ করতে পারে)। এ-প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ۝٢٧ لِّيَشْهَدُوا
مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ ۖ

---

[৬] সূরা ফজর, ৮৯ : ১-২।

[৭] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৭।

> "এবং মানুষের মধ্যে হাজ্জের ঘোষণা করে দাও। তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং সর্বপ্রকার ক্ষীণকায় উটের পিঠে (সওয়ার হয়ে), তারা আসবে দূর-দূরান্ত পথ অতিক্রম করে, যাতে তারা তাদের কল্যাণময় স্থানগুলোতে পৌঁছতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে জীবিকা হিসেবে যা দান করেছেন, তার ওপর নির্দিষ্ট দিনগুলোতে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতে পারে।"[৮]

অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, এই নির্দিষ্ট দিনগুলোই হলো যুল-হিজ্জাহ মাসের দশদিন।

হাজিদের ক্ষেত্রে যুল-হিজ্জাহর এই দশদিনকে বিশিষ্ট করার কারণ হলো, এ-সময় তারা কুরবানির জন্তু হাঁকিয়ে নিয়ে যান। কুরবানির এ-জন্তু দ্বারাই হাজ্জ পূর্ণতা লাভ করে এবং দশম দিন অর্থাৎ কুরবানির দিন তারা এর গোশত আহার করে। মীকাত থেকে কুরবানির পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়ার সর্বোত্তম সময় হলো এই নির্দিষ্ট দিনগুলো।

হাদীসে এসেছে, "সর্বোত্তম হাজ্জ হলো উঁচু আওয়াজে (তাকবীর) পাঠ করা এবং (রক্ত) প্রবাহিত করা।"[৯]

অতএব চতুষ্পদ জন্তুর এই নিয়ামাতের ওপর কৃতজ্ঞতা পালন হিসেবে এই দিনগুলোতে বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করতে হয়। এই জন্তুগুলোর একাংশের সম্পর্ক হাজিগণের দ্বীনের সাথে এবং অপর অংশের সম্পর্ক তাদের পার্থিব জীবনের সাথে। তবে সর্বোত্তম কাজ হলো এ-দিনগুলোয় বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করা, বিশেষ করে হাজ্জের সময়। আল্লাহ তাআলা হাজ্জের সময় বেশি পরিমাণে তাঁকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٩٩﴾

[৮] সূরা হাজ্জ, ২২ : ২৭-২৮।

[৯] তিরমিযি, ৮২৭।

"তোমরা যখন আরাফা থকে ফিরে আসবে, তখন মাশআরুল হারামের নিকট পৌঁছে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তিনি যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন, ঠিক সেভাবে তাঁকে স্মরণ করবে, যদিও তোমরা ইতঃপূর্বে বিভ্রান্ত ছিলে। অতঃপর তোমরাও সেখান থেকে ফিরে আসবে, যেখান থেকে সবাই ফিরে আসে। আর আল্লাহর কাছেই ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।"[১]

আয়াতে মাশআরুল হারামে (মুযদালিফায়) আল্লাহকে স্মরণ করতে বলা হয়েছে। এখানে যুল-হিজ্জাহর দশদিনকেই বোঝানো হয়েছে। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا

"আর তোমরা যখন হাজ্জের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শেষ করবে, তখন আল্লাহকে এমনভাবে স্মরণ করবে, যেমন তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদেরকে স্মরণ করতে, বরং তার চেয়েও বেশি মনোযোগ সহকারে স্মরণ করবে।"[২]

এখানে ইয়াওমুন নহর (কুরবানির ঈদের দিন) উদ্দেশ্য। এটি যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশদিনের সর্বশেষ দিন। এরপর দশদিন শেষ হওয়ার পরেও আল্লাহ তাআলা নির্দিষ্ট কিছু দিনে তাঁকে স্মরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ আইয়ামে তাশরীক। আস-সুনান গ্রন্থসমূহে রয়েছে, আল্লাহর রাসূল (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الْجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ

"আল্লাহর স্মরণকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যেই বিধান দেওয়া হয়েছে কা'বাঘর প্রদক্ষিণ করা, সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে বিশেষ নিয়মে দৌড়ানো এবং কঙ্কর নিক্ষেপ করার।"[৩]

এসব কিছুই হাজ্জ পালনকারীর সাথে সম্পর্কিত আমল।

---

[১] সূরা বাকারা, ২ : ১৯৮-১৯৯।

[২] সূরা বাকারা, ২ : ২০০।

[৩] আবূ দাউদ, ১৮৮৮; তিরমিযি, ৯০২।

আর যারা হাজ্জ পালন করতে আসতে পারেনি, তারাও যুল-হিজ্জাহর দশদিন হাজিদের মতোই কাজ করবে অর্থাৎ তারাও বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং কুরবানির জন্তু প্রস্তুত করবে।

কুরবানির জন্তু প্রস্তুত করার ক্ষেত্রে যুল-হিজ্জাহর এই দশদিনে কুরবানির জন্তু প্রস্তুত করবে, যেভাবে হাজ্জের মৌসুমে লোকেরা (এই দিনগুলোয়) জন্তু নিয়ে আসে। ইহরাম বাঁধার ক্ষেত্রেও হাজিদের মতো কাজ করবে। অর্থাৎ যারা হাজ্জ পালন করতে পারছে না, যখন যুল-হিজ্জাহর ১ম দিন শুরু হবে এবং তারা কুরবানি করারও ইচ্ছা পোষণ করবে, তখন তারাও নিজেদের চুল ও নখ কাটবে না। উম্মে সালামা (রদিয়াল্লাহু আনহা)-এর হাদীসেও বিষয়টি স্থান পেয়েছে। মুসলিম (রহিমাহুল্লাহ) এটি উল্লেখ করেছেন।[৪] ইমাম শাফিয়ি, আহমাদ এবং হাদীসের অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম এ-মতটি গ্রহণ করেছেন।

এই নির্দিষ্ট দিনগুলোতে হাজিদের মতোই অন্যরা বেশি বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করবে। কারণ এই বিশেষ দিনগুলোয় সকলের জন্যই বিধান দেওয়া হয়েছে বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করার।

বুখারি (রহিমাহুল্লাহ) তার সহীহ গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আবদুল্লাহ ইবনু উমর এবং আবূ হুরায়রা (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) যুল-হিজ্জাহর প্রথম দশদিন বাজারে যেতেন। তারা উচ্চস্বরে তাকবীর পাঠ করতেন এবং তাদের তাকবীর শুনে অন্যরাও তাকবীর পাঠ করতেন।

কিতাবুল-ঈদাইন গ্রন্থে জাফর ফিরয়াবি (রহিমাহুল্লাহ) উল্লেখ করেছেন, ইয়াযীদ ইবনু আবী যিয়াদ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, 'আমি সাঈদ ইবনু যুবাইর, মুজাহিদ, আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা (কিংবা তাদের যেকোনো দুজনকে) এবং যে-সকল ফকীহকে দেখেছি, তারা সকলেই যুল-হিজ্জাহর দশদিনে এই তাকবীর বলতেন,

اَللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكْبَرُ، اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلهِ الْحَمْدُ

(আল্লাহ সর্বমহান, আল্লাহ সর্বমহান, তিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং আল্লাহই সর্বমহান, আল্লাহই সর্বমহান, এবং আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা।)

---

[৪] দেখুন—মুসলিম, ১৯৭৭।

আল্লাহ তাআলা মুমিনদের অন্তরে কা'বাঘর দেখার প্রবল বাসনা সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু প্রত্যেকেই প্রতিবছর দেখার সৌভাগ্য লাভ করতে পারে না। তাই তিনি বিধান দিয়েছেন, যাদের দেখার সামর্থ্য রয়েছে, জীবনে একবার হলেও তাদেরকে হাজ্জ করতে হবে। এমনিভাবে যারা হাজ্জ পালন করতে আসতে পারবে এবং যারা আসতে পারবে না, তাদেরকে এই হাজ্জের মৌসুমে একই ধরনের কিছু কাজ করার বিধান দিয়েছেন। যারা হাজ্জের উদ্দেশ্যে আসতে পারবে না, তারা নিজ নিজ ঘরে এই দশ দিন আমল করবে। যে আমল জিহাদ থেকেও উত্তম, যে জিহাদ হাজ্জ থেকেও উত্তম।

পাপকাজের কারণে বান্দা আল্লাহ থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং বিতাড়িত হয়ে যায়, যেভাবে আনুগত্যের কারণে বান্দা আল্লাহর সান্নিধ্য ও ভালোবাসা লাভ করে।

প্রিয় পাঠক, তোমাদের ভাইয়েরা তো এই দিনগুলোয় ইহরাম বেঁধেছে, কা'বাঘরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে এবং তালবিয়া পাঠ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার ধ্বনিতে মুখর হয়েছে। তারা চলে গিয়েছে আর আমরা বাড়িতে। তারা কা'বার কাছে আর আমরা দূরে। তাদের সাথে যদি আমাদেরও সৌভাগ্য হতো, তা হলে তো আমরাও অংশীদার হতে পারতাম।

অক্ষম হওয়ায় আমরা বাড়িতে বসে আছি। তাই তাদের মতোই আমাদের পুণ্য লাভ হবে। অনেক সময় তো আত্মিক অভিযাত্রী বাস্তবিক অভিযাত্রীর তুলনায় অগ্রগামী হয়ে থাকে।

অতএব এ-সময়টাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করো। এই মহিমান্বিত দিনগুলোতে সুযোগের সদ্ব্যবহার করো। এর কোনো বদল হয় না এবং এর কোনো মূল্য দেওয়া যায় না।

আমল দ্রুত সম্পন্ন করো এবং আমলের উদ্যোগ গ্রহণ করো। মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে আসার পূর্বেই তাড়াতাড়ি সেরে নাও। আমলে অবহেলাকারী পরিতাপ করবে। সৎকর্ম করার জন্য প্রার্থনা করবে, কিন্তু তার আবেদন নাকচ করা হবে। দুনিয়ার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষাকারী ও তার আকাঙ্ক্ষার মাঝে অন্তরাল সৃষ্টি হয়ে যাবে। মন্দ কৃতকর্মের কারণে মানুষ গর্তে আটকা পড়ে থাকবে। এসবের পূর্বেই তুমি আমলের উদ্যোগ নাও এবং দ্রুত আমল সম্পন্ন করো।

হে ওই ব্যক্তি, যার বয়স চল্লিশের কোটা পার হয়েছে, যার বার্ধক্যের প্রভাত-রশ্মি উদিত হয়ে গেছে!

এভাবে আরও দশটি বছর যার পার হয়ে গিয়েছে, পঞ্চাশের কাছে এসে পড়েছে!

মৃত্যুর রণক্ষেত্রে যে ষাট বছর শেষ করে সত্তরে এসে পৌঁছেছে, এতসব কিছুর পর এখন তো শুধুই মৃত্যুর অপেক্ষা করছো!

যার পাপরাশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, তোমার কি সম্মানিত লেখক ফেরেশতাদের লজ্জা হচ্ছে না? নাকি তুমি দ্বীনকেই অস্বীকার করছো?

যার হৃদয়ের অন্ধকার রাতের মতো ছেয়ে গেছে! তোমার হৃদয়ের কি এখনো সময় হয়নি আলোকিত করার কিংবা আরও একটু কোমল করার? এই দশদিন সময়ে তোমার মনিবের সুবাতাস গ্রহণ করো। কারণ এই দিনগুলোতে রয়েছে সুবাতাস, তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। যে পাবে সে তো জীবনভর সুখী হবে এবং সমৃদ্ধি লাভ করবে!

দ্বিতীয় মাজলিস : আরাফার দিন ও ঈদুল আযহার ফযীলত

সহীহাইন-এর বর্ণনায় এসেছে, 'এই ইয়াহূদি উমর ইবনুল খাত্তাব (রদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলল, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনাদের গ্রন্থে একটি আয়াত রয়েছে। আমাদের ইয়াহূদি সম্প্রদায়ের ওপর যদি এমন কিছু অবতীর্ণ হতো, তা হলে আমরা সেদিনকে ঈদ বানাতাম!' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন আয়াত?' সে বলল, আয়াতটি হলো,

اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِيْنًا

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম।"[৫]

[৫] সূরা মায়িদা, ৫ : ৩।